Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.15
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.15
Pages	247-252
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা।। কল্পনা ভৌমিক, প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, মূল্য ১১৫ টাকা।

'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' জাতীয় মূল্যবান গবেষণাময় গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য ঢাকা বাংলা একাডেমীকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছিনা। এদিকে ওদিকে দু-একটা লেখা বেরোলেও, বোধ হয়, বাংলা ভাষায় এই প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক যা উত্তরসূরীদের পাণ্ডুলিপি পঠন-পাঠনে উৎসাহ প্রদান করবে। এ গ্রন্থটিকে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের যে একটা গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, বাংলা একাডেমীর একটা রুচি বোধেরও পরিচয় পাওয়া গেছে।

ইতিহাস দৃষ্টে দেখা যায় যে ইংরেজদের আগমনের পর ভারতীয় পুথির জন্য পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান শুরু হয়। তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের কাছে বহু ভারতীয় ও ইংরেজ বা বিদেশী পণ্ডিত এ ব্যাপারে আবেদন করেছিলেন এবং সরকারের অর্থানুকূল্যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজও হয়েছিল।

ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার পাণ্ডুলিপির প্রথম সংগ্রহের নমুনা পাই ১৮০৭ সালে প্রকাশিত Catalogue of Sanskrit and other Oriental Manuscipts presented to the Royal Society by Sir William and Lady Jones (pages 401-415 of vol-xiii, Sir William Jones' works, London, 1807) গ্রন্থে। এর পর শৃঙ্খলায়িত পুথির পরিচয় পাই ম্যাকেনজি-সংগ্রহে (Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts collected by the Lieut-col. Colin Mackenzie, by H. H. Wilson, Calcutta, 1928)। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির একটি তালিকা প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে (Sucipustaka, a list of MSS of Fort William, the Asiatic Society in Calcutta, 1938)। এর পর থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে পুথির তালিকা প্রস্তুত হতে থাকে এবং আজও হচ্ছে। মৎ-সম্পাদিত Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit Sahitya Parishat, Calcutta, 1984 নামক গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে এর একটা কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার ইতিহাস দেওয়া আছে।

আমাদের দেশে পাণ্ডুলিপি নিয়ে চর্চার ইতিহাস প্রায় দু'শ বছরের। ১৮০৭ সাল থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু হলেও পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব

বেশী দিন হলো শুরু হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে V. S. Sukthankar-এর উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে মহাভারতের বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ প্রকাশমানসে যে Prolegomena-র সৃষ্টি হয়েছিল, তাই বোধ হয় ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রথম প্রয়াস। এর কয়েক বছর পরে S. M. Katre-র Indian Textual Criticism (1941) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দু'খানি গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ মানুষের কাছে এক আদর্শ স্থানীয় নমুনা বলে বিবেচিত হত। আমার বিবেচনায় এই দু'খানি বইয়ের পরেই ডঃ কল্পনা ভৌমিকের অবদানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যতদূর জানা আছে বাংলা বা ভারতীয় ভাষার মধ্যে এই প্রথম প্রসূন। সম্প্রতিকালে অবশ্যি K.T. Pandurangi-র The Wealth of Sanskrit Manuscripts in India and Abroad, Bangalore, 1978- এ বেরিয়েছে। কিন্তু সেটা কেবল ইতিহাসমাত্র। এর পর H.L.N. Bharati-র An Introduction to Indian Textual Criticism and Modern Book Publishing (১৯৮৮) বইখানা যে বেরিয়েছে, সেটা কিন্তু গবেষণামূলক নয়। ভাষার দৃষ্টি থেকে কিভাবে Textual Criticism- কে কাজে লাগানো যায় তার একটা প্রয়াসমাত্র। কিন্তু ডঃ ভৌমিকের অবদান অনবদ্য।

প্রায় দশ বছর যাবৎ পাণ্ডুলিপির বিবর্ণ ও জীর্ণ পত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্না, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিনী, দুঃসাহসিনী লেখিকা শ্রীমতী কল্পনা ভৌমিক মহাশয়াকে সকৃতজ্ঞ অজস্র ধন্যবাদ তার এই প্রয়াস বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য। পাণ্ডুলিপির পঠন ও পাঠন এ যুগে এক দুঃসাহিসক কাজ। এই নীরস শাস্ত্রের মধ্যেও যে উঁনি সরস লোকোত্তর আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, তার জন্য ওঁনাকে অভিনন্দন। ঢাকার পুথিরাজ্যে বিচরণ করে উঁনি এক অপূর্ব রত্নের সন্ধান দিয়েছেন।

'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এছাড়া, ভূমিকা ও পরিশিষ্টও আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার কতকগুলো উপাধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টিতে লিপির উৎপত্তির ইতিহাস, প্রকার-ভেদ ও লিপির বিবর্তনধারা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। লিপির পরিচয় অংশে লেখিকা খুব সতর্কতার সংগে লিপিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রদান করে প্রাচীন কালে যেভাবে ভারতবর্ষে নানা প্রকার লিপির বিকাশ হয়েছিল, তার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভৌমিক ললিতবিস্তরের দশম অধ্যায়ে যে ৬৪ প্রকার লিপির নাম আছে, তারও উল্লেখ করেছেন। সেই তালিকায় উল্লিখিত প্রথম যে লিপির নাম তা হলো ব্রাহ্মী ও দ্বিতীয়টির নাম খরোষ্ঠী। এই প্রথম ও দ্বিতীয়ের নামানুসারেই অশোকের শিলালিপির নাম হয়েছে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। সম্প্রতিকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর দু'খানি গবেষণামূলক গ্রন্থে 'শেললিপি' ও 'ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রিত' শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন (Deciphament of the Shell Script, Lucknow, 1983 এবং

Kharoshti and Kharoshti- Brahmi Inscriptions in West Bengal (India), Indian Museum Bulletin, xxv, Calcutta, 1990)। এদু'টি লিপির আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা।

বর্ণলিপি সৃষ্টির আগে আরও ছটি স্তর আছে, যথা প্রস্তরলিপি, চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি, স্বরলিপি এবং বর্ণলিপি। পৃথিবীর লিপির উৎপত্তির ইতিহাস ও বিকাশ সম্বন্ধে গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা আছে I. Taylor- এর History of the Alphabet (1899) নামক গ্রন্থে। এর পরে অবশ্যি ডেভিড্ ডিরিঞ্জারের অনুরূপ নামের গ্রন্থেও এর বিশদ বিবরণ আছে। ব্রাহ্মী লিপি থেকে কিভাবে দেবনাগরী ও তারপর বাংলালিপির উৎপত্তি হলো তার একটা মনোজ্ঞ ইতিহাস আছে। আট পৃষ্ঠা ব্যাপী এক তুলনামূলক চিত্রের সাহায্যে এ বিবর্তনের ধারা দেখিয়েছেন। লেখিকার এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘাঙ্গী না হলেও কিন্তু খুবই সারগর্ভ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাণ্ডুলিপির পরিচিতি আছে। এ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে পাণ্ডুলিপির উৎপত্তির ইতিহাস, পাণ্ডুলিপি শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ এবং পুথি ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রভৃতি নানান বিষয়ের অবতারণা আছে। পুথির আকার ও লিখনপদ্ধতির প্রসঙ্গটুকু খুব মনোজ্ঞ। পুথিতে কত রকমের মন্তব্য থাকে তা লেখিকা উদ্ধৃতির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পুথি যারা লিখতেন তারা সাধারণতঃ বলতেন–

কর-কৃতমপরাধং ক্ষন্তুমর্হন্তি সন্তঃ।

'হাতের লেখা অস্পষ্টতার দরুন যে অপরাধ, সুধীজন নিশ্চয়ই তা ক্ষমা করবেন।'

সাধারণতঃ একটি পুথি থেকে আর একটি পুথি নকল করা হত। তাই লিপিকর নিজের দোষ ক্ষালন করার জন্য লিখতেন–

যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্ট্বা তাদৃশং লিখিতং ময়া।
যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন দীয়তে।।

'মূল পুস্তক থেকে যেমন দেখা, তেমনি লেখা হয়েছে। যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ থাকে তাহলে আমার দোষ নয়'।

পুথি নকলচোর চির কালই আছে। কাজেই পাছে পুথি কেউ নকল করে বা চুরি করে সেজন্য পুথিতে লেখা থাকত–

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ শুকরী তস্য পিতা তস্য চ গর্দভঃ।।

এরই নকল করে বাংলা পুথিতে লেখা থাকত-

জতনে লিখিলাম পুস্তক যে করিবে চুরি।
বাপ হয় গাধা তার মা হয় শুকরী।।

পুথি চুরির ব্যাপারে এ রকম নানা ধরনের উক্তির সমাবেশও আছে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন পদ্ধতি অধ্যায়ে লেখিকার গভীর তত্ত্বদর্শনের নিদর্শন পাওয়া যায়। যারা পুথি নিয়ে কাজ করবেন, তাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি বিশেষ উপযোগী। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভৌমিক বেদ, উপনিষদ্ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের পুথির সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থসমাপ্তিতে কি জাতীয় বিষয় থাকে, তা উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই শকাব্দ, সম্বৎ, বঙ্গাব্দ, মঘী অব্দ, মল্লাব্দ প্রভৃতি বহু অব্দের উল্লেখ করে কিভাবে এদের কালগণনা করা হয়, তার আলোচনা করেছেন। অপূর্ব এই আলোচনা। আমার মনে হয় কেবল গবেষকদের জন্য নয়, ঐতিহাসিকদের কাছেও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। কালগণনা ব্যাপারে পুথির এক বিশেষ ধরন আছে। সাধারণতঃ 'দক্ষিণাগতি' বা 'বামাগতি'তে কাল গণনা করা হয়। শ্লোকে বা গদ্যে এ কাল গণনার বিবরণ থাকে। লেখিকা পুথি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্লোকের অর্থ নিরূপণ করে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। কি কি শব্দে কি কি সংখ্যা হয়, তার একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। আমার ধারণা এই অংশটি লেখিকার বুদ্ধিমত্তার ও গবেষণাময় প্রগাঢ় জ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ। প্রত্যেক পুথি পাঠকের এ সমস্ত শব্দ কণ্ঠস্থ করে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

একশ' আট পৃষ্ঠাব্যাপী চতুর্থ অধ্যায়ে ডঃ ভৌমিক এক অনন্যসাধারণ গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যায়টি হলো 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি'। এর মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হলো পাণ্ডুলিপিতে এক অক্ষরের কত রকম ধরনের লেখার পদ্ধতি ছিল তার একটা নমুনাসহ বিস্তৃত ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্য পরিবেশন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পুথিতে লেখা অক্ষরসমূহকে বিন্যাস করে দেখিয়েছেন বাংলা অক্ষরের বিবর্তনের ধারা। প্রথমে পাণ্ডুলিপির একটা আক্ষরিক জ্ঞানের পরিচয় প্রসঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক বাংলা লিপি পর্যন্ত এক কালানুপাতিক বাংলা অক্ষরের পরিবর্তনের ইতিহাস দিয়েছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তী কালের গবেষকদের অশেষ সুবিধে প্রদান করবে। তারপর পুথি থেকে একটি করে ছত্র দিয়ে এ বিবর্তনের ধারার এক চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাই বাহুল্য এই অংশটি গবেষণা পদ্ধতির চরম নিদর্শন। হয়ত এ উদ্ধৃতিই চরম কথা নয়। কিন্তু এটা এত বিস্তৃত ও ব্যাপক যে এতদতিরিক্ত যা পাওয়া যাবে, তা খুবই সামান্য ব্যবধান সৃষ্টি করবে। বাংলা হরফে যে সংস্কৃত পুথি লেখা হয়েছে, তার বিবর্তনের ধারা দেওয়ায় নানা রকমের অক্ষর এতে পাওয়া যাবে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর The Origin of the Bengali Script-নামক গ্রন্থে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলা হরফের বিবর্তনের ধারা দেখাননি।

তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা হরফের উৎপত্তির কালানুপাতিক ধারা প্রদর্শন। সেদিক থেকে যতটুকু প্রয়োজন ছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু ডঃ ভৌমিক আরও এক স্তর গভীরে প্রবেশ করে ঠিক যেভাবে বিবর্তনের ধারা দেখিয়েছেন, তাও বাংলা হরফের উৎপত্তির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। এ অংশটি যথার্থ প্রশংসার যোগ্য, শ্রীমতী ভৌমিকের তীক্ষ্ণ গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। প্রতি বাংলা পুথি গবেষকের এ অধ্যায়টি পড়া অতি অবশ্য বর্তব্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঠিক অনুরূপভাবেই সংস্কৃত হরফের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে পুণা থেকে প্রকাশিত Descriptive Catalogue of the government collection of Manuscipts, vol-XVII, pts II-1-4 (Jaina MSS)। এই বইয়ে দেবনাগরীতে লেখা জৈনেরা যে এক অক্ষরের কত রকম হরফ ব্যবহার করতেন, তার একটা নিদর্শন দেওয়া আছে। সম্প্রতিকালে তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় Old Bengali Text (Calcutta University, 1963) বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে প্রাচীন বাংলা "হাজার বছরের বৌদ্ধগান ও দোহা" যে বাংলা হরফেই লেখা হয়েছিল, তারও একটা নিদর্শন দিয়েছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত সেই চর্যাগীতির অক্ষরসমূহও বাংলা হরফ। তারই মাধ্যমে ভাষাও যে বাংলা তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয় এ অধ্যায়টি প্রত্যেক শিক্ষিত বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের অবশ্য পঠনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়টি ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ উপযোগী। বাংলা বা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে কি ধরনের ভুলের আধিক্য থাকে, তার একটা নাতিদীর্ঘ আলোচনা আছে। পাণ্ডুলিপিতে এ জাতীয় বানান ভুলের পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলো নিয়ে এক সুচিন্তিত অভিমত আছে। লেখিকা দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত পুথি বাংলা হরফে লেখা হলেও উভয় ভাষার পাণ্ডুলিপির লিখনরীতিতে কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। এই বৈসাদৃশ্যগুলোই ড. ভৌমিক দেখিয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ে। এ জন্যই লিপিকরেরা পাঠকদের নিকট আবেদন করে প্রার্থনা করতেন—

> অদৃশ্যভাবান্ মতিবিভ্রমত্বাৎ পদার্থহীনং লিখিতং যদত্র।
> তৎসর্বমার্যৈঃ পরিশোধনীয়ং কোপং ন কুর্যাৎ খলু লেখকস্য।।

"মূল গ্রন্থ ঠিক মত না দেখার জন্য (অর্থাৎ অস্পষ্টতাহেতু), বোঝার ভুলের জন্য (অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে ভুল বোঝার জন্য) অর্থহীন যা এখানে লেখা হলো, সে সমস্তই সুধীগণ (নিজগুণে) সংশোধন করে নেবেন, লেখকের ওপর কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করবেন না।" প্রাকৃতভাষার পুথিও বাংলা হরফে লেখা হত বলে এ জাতীয় ভুলের

সমাবেশ দেখা যায়। ফলে মূলপাঠে অশুদ্ধি দেখা যায়। মৎপ্রণীত Prakrit Textual Criticism (Jain Journal, XXIV, 1988)- নামক প্রবন্ধে এর আলোচনা আছে।

এ বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অত্যন্ত জটিল বিষয়ের আলোচনা আছে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পদ্ধতিতে। এ আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুগভীর। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকালে একজন গবেষক যে জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার একটা বিস্তৃত আলোচনা আছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এর পর পরিশিষ্ট।

বইটির ভাষা সরল, সহজ ও সরস। বাগ্‌বিন্যাস পদ্ধতি সংযত ও শৃঙ্খলায়িত। বিষয়বস্তু স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। এ বইটি বাংলা ভাষার এক লুপ্ত ও অনধ্যায়িত অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পৃথিবীর প্রতিটি গ্রন্থাগারে এ বইটি রক্ষিত হোক যেমনভাবে পুথি রক্ষার জন্য পুথি লেখকেরা বলতেন—

> তৈলাদ্ রক্ষেৎ জলাদ্ রক্ষেদ্ রক্ষেৎ শিথিল-বন্ধনাৎ।
> মূর্খহস্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তকম্ ।।

'পুথিকে তেল থেকে রক্ষা করা উচিত, জল থেকে রক্ষা করা উচিত, ঢিলে করে বাঁধা থেকে রক্ষা করা উচিত। পুথি বলছে, আমাকে কখনও মূর্খের হাতে দিওনা।'

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়